Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ক্ষুধা ও আশা : অন্তরঙ্গ জীবনবীক্ষা ও শিল্পসুষমা

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুপ্রিয়া রানী দাস
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.8
Pages	১৩৭-১৫০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ক্ষুধা ও আশা : অন্তরঙ্গ জীবনবীক্ষা ও শিল্পসুষমা

সুপ্রিয়া রানী দাস*

সার-সংক্ষেপ : আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এক অনন্য অবস্থানের দাবিদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎকালীন দুর্ভিক্ষের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবনের নিদারুণ আলেখ্য এই উপন্যাস। সঙ্কটকালীন বিচিত্র শ্রেণিপেশার মানুষের নিপুণ মনোবিশ্লেষণ ও সঙ্কটমোচন-প্রচেষ্টার যে বাস্তবচিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন, তারই বিস্তারিত স্বরূপসন্ধান এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট। পাশাপাশি ঔপন্যাসিকের শিল্পনিরীক্ষার কুশলতাও বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) বাংলা সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ আর নাটক মিলে গ্রন্থ রচনা করেছেন ৭০টিরও বেশি। বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবনে, মানবমনে তার প্রতিবেশ ও জীবনসংলগ্ন ঘটনাসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যজগতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এই কলমশিল্পী। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক সংঘাত, সুবিধাবাদ প্রভৃতিকে বিষয় করে প্রভূত সাহিত্যিক প্রচুরসংখ্যক সাহিত্য রচনা করেছেন, করে চলেছেন। কিন্তু এসব প্রতিকূলতার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, প্রতিবাদ এবং এর মধ্য থেকেই ইতিবাচকতার আশাবাদ চিত্রণে অভূতপূর্ব ও অনবদ্য সফলতা দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবনবাদী লেখক। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লেখেন তিনি' (তবিবুর, ২০১৫ : ৮৭)। একই কথা প্রযোজ্য তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও। আলাউদ্দিন আল আজাদের নিজের কথায় :

> এই পঁচিশ বছরে রচিত ও প্রকাশিত আমার ষোলোটি উপন্যাস, যদিও সমসাময়িক রুচি ও বাণিজ্যিক চাহিদা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি ছোট আকৃতির সবগুলো মিলে একটি বিশাল মিউরাল এর মতো দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটির কাহিনী ও চরিত্র আলাদা আলাদা, প্রত্যেকটির সঙ্কেতও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু একজায়গায় মিল, সে হোলো,

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> বাস্তবতা। আমাদের সমাজ কিভাবে বদলে যাচ্ছে এমন অবস্থা তৈরি করছে যাতে নতুন নতুন আনন্দ বেদনা, এসব তারই গাঢ়বর্ণ প্রতিচ্ছবি। (উদ্ধৃত, সিকদার, ২০০৩ : ১৪২)

অর্থাৎ, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চারপাশের জগতই শিল্পরূপ পেয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখনীতে। তিনি বয়ন করেছেন দুর্যোগে আলোড়িত মানুষের জীবনকথা, যারা মূলত কোনো দোষ না করেও হয়েছে শোষণের শিকার।

আলাউদ্দিন আল আজাদের দ্বিতীয় উপন্যাস *ক্ষুধা ও আশা*। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মনুষ্যসৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ উপনিবেশিত ভারতের মানুষকে কীভাবে প্রায় বিনষ্ট করে দিয়েছে তারই দলিল এই উপন্যাস। সেই সময়ে এই ভূখণ্ডের মানুষের নিয়তির প্রভাবক ছিল দুটি দেশ – ব্রিটেন ও জাপান। যুদ্ধে জাপান ছিল অক্ষশক্তির সামিল আর ব্রিটেন মিত্রশক্তির অংশ। অবিভক্ত ভারত ছিল ব্রিটেনের কলোনি এবং ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের অত্যন্ত লাভজনক একটি উৎস। ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্কা ছিল যে, অবস্থানগতভাবে নিকটবর্তী হওয়ায় জাপান যে কোনো সময় ভারত আক্রমণ করতে পারে, আর জাপানিদের এই ভূখণ্ডে প্রবেশদ্বার হবে বাংলা অঞ্চল। ফলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই অঞ্চলের খাদ্য-বস্ত্র ক্রমশ সরিয়ে ফেলা হতে থাকে। এই অঞ্চলে চাহিদা ও মূল্য বেড়ে যায় খাদ্য-বস্ত্রের। একটি শ্রেণি বেশি মুনাফার লোভে মজুদদারি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এসব দ্রব্যের। আর এসবেরই নির্মম শিকার হয় কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, যুদ্ধে যাদের কোনো স্বার্থ নেই! ইংরেজি উনিশশ তেতাল্লিশ, বাংলা তেরশ পঞ্চাশ সনের মহাদুর্ভিক্ষে লাখে লাখে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন্মৃত হয় আরও ব্যাপক সংখ্যক।

এই সময়েরই আলেখ্য *ক্ষুধা ও আশা*। একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মানুষের জীবনকথা উপজীব্য হয়েছে এ উপন্যাসে। মূলত নরসিংদী ও ঢাকার আংশিক এলাকার চিত্র উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখক কাহিনি বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থে 'লেখকের নিবেদন' অংশে তিনি বলেছেন :

> এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তার ঝাঁজ এখনো ভুলতে পারি না। উত্তরে আমার বক্তব্য ছিল শাদামাটা।
>
> এক বন্ধুকে বলেছিলাম, চারপাশে ঘটে যাওয়া পাঁচটি ঘটনা আমার কাছে এসে যদি ভিড় না করত, তাহলে নিশ্চয়ই আমার হাত দিয়ে এই কাহিনী বেরুত না। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : লেখকের নিবেদন)

২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি–এ সকল দুর্যোগের প্রভাবে মানুষের জীবনে যে দুর্ভোগ ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল সে-সবই *ক্ষুধা ও আশার* প্রতিপাদ্য :

> আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) উপন্যাসে সামাজিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের বাঁচার প্রয়াস, দুর্নীতি, নারীত্বের অবমাননা প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। তবে তা বিভাগ-পূর্বকালীন দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে। (শাহীদা, ১৯৯২ : ১২৫)

কৃষিজীবন থেকে উন্মুলিত শহরমুখী অনেক পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার উপন্যাসটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসটির অন্যান্য চরিত্রও মূলত কোনো না কোনোভাবে এই পরিবারটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের মাধ্যমেই তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যাত হয়েছে পাঠকদের উদ্দেশ্যে। দেখানো হয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয় আর মানুষের অসহায়তার সুযোগে কিছু মানুষের স্বার্থবাদিতা, সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিও :

> বিনষ্ট সমাজ, বিনষ্ট আর্থ-রাজনীতি এবং বিনষ্ট মানুষের নিয়ন্ত্রণে বিপর্যস্ত জীবনের গোটা ছবিই উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জোহার বহির্সংগ্রাম ও অন্তর্সংগ্রামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে একটা সময়-খণ্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনরূপ। শ্রেণীচ্যুত, গ্রামবিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তান জোহা শহরে পা-ফেলেই উপলব্ধি করে এর জান্তব ও অন্তর্শূন্য রূপ। দুঃখ ও যন্ত্রণার জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপক্ব হয়ে উঠতে থাকা জোহার অন্তর্জগতে একটা প্রত্যাশা ও স্বপ্নের অনুরণন শুরু থেকেই লক্ষ করা যায়। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১৭৩)

জোহা শেষপর্যন্তও ত্যাগ করে না আশাবাদ।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর আশা-হতাশা, সংকটকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর প্রধানতম চরিত্র জোহার ইতিবাচক মানসিকতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি এগিয়ে গেছে :

> জীবনের মর্মন্তুদ বাস্তব রূপের সমান্তরালে আর একটি প্রত্যাশিত জীবনের স্বপ্নসাধ এ-উপন্যাসে মূল্য পেয়েছে। যে-জন্য দেখি, অন্ধকার ও বিকারে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত সময়সন্ধিতেও মানুষ আলোকিত জীবনের সম্ভাবনাকে লালন করেছে। পিতা হানিফের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং অপঘাত মৃত্যু, বোন জহু-র ধর্ষিতা হয়ে নিষিদ্ধ জীবনের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া, প্রেমের পরিবর্তে দাম্পত্যসম্পর্কের স্থৌল্য গ্রহণের অক্ষমতায় লিনার আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জোহা অন্তর্জগতে রক্তাক্ত হলেও তার আত্মসন্ধান ও জীবনসন্ধান থেমে থাকেনি। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১৭৩)

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে খাপ খাইয়ে নেয় বা খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তারই দলিল এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিক কুশলতার সঙ্গে করেছেন মানুষের অন্তর্জগতের বিশ্লেষণও। এই দিক থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম *ক্ষুধা ও আশা*। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ, তাদের মানসিকতা, তাদের

রাজনীতিচেতনা, স্বার্থবাদ এবং সর্বোপরি বাঁচার সংগ্রাম অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পরূপের বিচারেও উপন্যাসটি নিরীক্ষাসফল। অলঙ্কারব্যবহার, চরিত্র ও শ্রেণি-অনুযায়ী ভাষা-সংলাপ সংযোজন, প্রতীক, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ প্রভৃতির ব্যবহার উপন্যাসটির বাস্তবতা আরও বৃদ্ধি করেছে।

৩

উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বিশেষ কিছু এলাকার মানুষের জীবনকে ঘিরে। কিন্তু তাদের জীবনযুদ্ধ আসলে সমগ্র অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামেরই প্রতিফলন :

> আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলাদেশী উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন – *ক্ষুধা ও আশা*। গ্রাম জীবনের বৈচিত্র্য, শহর-জীবনের অন্ধকার, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ যুগের সার্বিক পরিচয় *ক্ষুধা ও আশায়* সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের বস্তুনিষ্ঠা, জীবনবোধ ও মনোবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর *ক্ষুধা ও আশা*। (আকরম, ২০১০ : ১০৯)

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে নরসিংদী থেকে ঢাকায় অভিবাসনপ্রত্যাশী জনতার গ্রামত্যাগের দৃশ্যে :

> অদ্ভুত অবস্থা, ভোরের আলো ফোটার আগে শেষরাতের অন্ধকারে বেরুবার সময় ছিল এক পরিবার কিন্তু সূর্য ওঠার পর কয়গ্রাম পিছনে ফেলে জমিনের পথ থেকে বটতলায়, এসে থামলে, রীতিমত এক জনতা। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭)

গ্রামে বেঁচে থাকার সব আশা ফুরানোর পরই মূলত তাদের এই গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্ত। এদের মধ্যে সামিল হয়েছে চাষী হানিফের পরিবারও। কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে আগেই; স্ত্রী আর বাকি থাকা দুটি সন্তান 'মেয়েটি বড়, বয়স বছর ষোল, ছেলেটি তার ছোট, দু'জন পিঠাপিঠি' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭) – এদেরকে নিয়ে যাত্রা করেছে সে। গ্রামে কাজ এবং খাবার দুয়েরই সঙ্কট, দুর্দিনের বাজারে সামান্য নগদ টাকাও মূল্যহীন, কারণ –

> বাজার থেকে ধান চাউল উধাও, কাগজের তাড়া শুকনো পাতার সামিল। তাছাড়া একেকজনের শরীরের যা হাল, সুটকির মতো চিমসে গেছে, যেন একেকটি জ্যান্ত কংকাল। কোন্ দিন কে মরে তার ঠিক নেই। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭)

গ্রামে ভিক্ষা চাওয়ারও সুযোগ নেই, একদিকে লজ্জা অন্যদিকে ভিক্ষা দেওয়ার লোকের অভাব। তাই –

> এতজন জড়ো হয়েছে, সবারই লক্ষ্য শহর। সেখানে বড় বড় বাড়ি, নায়েব-নবাব, উজির-নাজির, বড় বড় আদমি। এবং ওরা সভ্য, শিক্ষিত, ধার্মিক। কোনোমতে জানটা নিয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই, ওঁরা বাঁচাবেন। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৮)

জীবনরক্ষার তাগিদে মানুষগুলো শহরমুখী। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর উপন্যাসে এদেরকে কেন্দ্র করেই কাহিনি বয়ন করেছেন। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে বিচিত্র অঙ্গনের মানুষের জীবনবেদ – কৃষিজীবন থেকে উন্মূলিত গ্রামীণ মানুষ, শহরে আগত উদ্বাস্তু, দিনমজুর, দেহপসারিনী, গ্রামীণ শোষক সুবিধাবাদী মহাজন সম্প্রদায়, মুসলিম লীগার, সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষিত অভিজাত তরুণী, সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারী যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিকার, পিতার নাম ভাঙিয়ে চলা সুবিধালোভী তরুণ, হিন্দু আইনজীবী ও তার পরিবার, মিলিটারি কন্ট্রাক্টর, ছিঁচকে চোর, ব্রিটিশ নারী-পুরুষ – তাদের জীবন-মানস, নীতি-নৈতিকতা ভাবনা, সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাসের রকমফের অতীব বাস্তবসংলগ্নভাবে চিত্রিত এখানে। উঠে এসেছে দুর্যোগ ও অবিশ্বাস পূর্ববর্তী নিস্তরঙ্গ অসাম্প্রদায়িক গ্রামীণ জীবন; স্থান পেয়েছে তৎকালীন ইতিহাস। মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল লিখেছেন–

> বস্তুত আজাদের এই উপন্যাসটি ইতিহাসের কিছু ঘটনার আলেখ্য–আছে কিছু ইতিহাসের পাত্রপাত্রী, তার সত্যতা যাচাই করার ব্যাপারটা সাহিত্যের বিষয় নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা ঠিক হবে না এই ক্ষুধা ও আশা গ্রন্থকে। ইতিহাসের পটভূমিকায় কতক সংগ্রামী মানুষের, অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষের বাঁচার লড়াই। সমাজের প্রচলিত ন্যায়নীতি আর মানবতা ইতিহাসের একটি বিশেষ লগ্নে কিভাবে পদদলিত-লাঞ্ছিত হয় তারই জীবন্ত একটি আলেখ্য ক্ষুধা ও আশা উপন্যাস। (উদ্ধৃত, সিকদার, ২০০৩ : ৫৪)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এই উপমহাদেশের রাজনীতিও উঠে এসেছে উপন্যাসের বয়ানে। বিশ্বযুদ্ধের লক্ষণসমূহ, ঘটনাক্রম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উল্লেখ আছে উপন্যাসটিতে। কিন্তু রাজনীতি বা ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়তো করতে চাননি ঔপন্যাসিক। বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রসঙ্গ টেনেছেন ইতিহাস-রাজনীতির :

> পয়লা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ উনচল্লিশ: জার্মেনী পোলান্ড আক্রমণ করলো। পর্দা উত্তোলিত হল–তখন থেকেই ইতিহাসের মহানাটকের অভিনয় শুরু, যদিও তার মহড়া চলছিলো অনেক আগে থেকেই। ...উনিশ শ একত্রিশে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার, উনিশ শ তেত্রিশে রাইখস্ট্যাগের আগুন এবং উনিশ শ ছত্রিশে মুসলিনীর আবিসিনিয়া দখল ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বহু দূর দূর স্থানে সংঘটিত হলেও, এরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৯০)

ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন উপমহাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যতের; পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসেরও ইঙ্গিত পাই আমরা। কিন্তু এ সবকিছুর বাইরে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন *ক্ষুধা ও আশায়*।

৪

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রসমূহের মনোজগৎ। সঙ্কটে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কোন পথে ধাবিত হয়, কীভাবে প্রধানতম জৈবিক চাহিদা

মনুষ্যত্বকে খর্ব বা লুপ্ত করে দেয়, আবার মানুষের অসহায়ত্বকে কীভাবে কিছু মানুষ নামের কীট নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায় – তারই প্রতিফলন দেখি এখানে। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে পিতামাতাও নিজেদের কন্যাকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখানো হয় তাকেও ঠিক উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেই প্রেক্ষাপটে। জহুকে বিক্রির উদ্যোগে এই মনোভঙ্গি লক্ষণীয় : 'আমরার কাছে থাকলে তো মরব। বেচলে বালা থাকব, আর আমরাও দু'পয়সা পাইয়াম। মরলে তো শেষ। মরণের থ্যে এইড্যা মন্দ কি, ভাইব্যা দেহ।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ২৩) সবাই না খেয়ে মরার চেয়ে এটাই তাদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে গ্রাহ্য বলে মনে হয়। তবু মরে না, বরং ফিরে আসে মনুষ্যত্ব, ইতিবাচকতা। তাই ফাতেমা সব লোভ সংবরণ করে, আশু খাবার সংগ্রহের সহজতম উপায়কে অগ্রাহ্য করে দালালকে তাড়িয়ে দেয়; বাঁচার আশায় পরিবারটি যাত্রা করে শহরে।

জহু ষোল বছরের কিশোরী। এই বয়সের চঞ্চলতা, কিছুটা উদ্দামতা, নিজেকে সাজানোর প্রবণতা আর অভিমান সমবেত তার চরিত্রে। উঠতি বয়স যে তার জন্য বিপদের, তাও সে জানে না। এ যেন 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'। শহরে এসেও অভাবের তাড়নায় ঠিকমতো খাওয়া জোটে না তার, মেটে না সামান্য বিলাসের ইচ্ছা। তাই সে মায়ের মনিবের বাড়ির মূল্যবান জিনিস চুরি করে। ধরা পড়ার পর মায়ের মার খেয়ে অভিমানে, কুমতলবী বাদশার টোপে পড়ে বাদশার বাড়ি চলে যায়। সেখানেই সে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর পাচার হয়ে যায় পণ্য হিসেবে। কয়েকবার হাতবদল হওয়ার পর হয়ে যায় পতিতা। এক পর্যায়ে এই ব্যবসার মূলধন বাড়ানোর জন্য নাচ ও গান শেখার চিন্তা করে সে। তবু আশা করে যে একদিন পরিবারের সঙ্গে দেখা হবে তার।

দারিদ্র্যজনিত অসহায়তা থেকে মুক্ত নয় পতিতালয়ের নারীরাও। পেটের দায়েই এরা বাধ্য হয় অনৈতিক কাজে। পতিতালয়ের খালার উক্তি বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করায় আমাদের – 'গরীবের দুনিয়াও নাই আখেরাতও নাই; দুনিয়াতে সে পুড়ে প্যাডের আগুনে আর আখেরাতে হাবিয়ায়! আমি এইড্যা বুঝি!' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭৩)

লিনার মনোজগতে আমরা লক্ষ করব উত্তাল দ্বন্দ্বময়তা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উপনীত হয়েছে স্থির সিদ্ধান্তে। শিক্ষিতা অভিজাত তরুণী লিনা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। মনোজগতে সে প্রতিনিয়ত হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। পরিবারে দেখেছে বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য। নিজের ভালবাসার মানুষ আলীকে পায়নি, তার কাছে পেয়েছে অবহেলা। জোহাকে সবসময় ইতিবাচকতায় অনুপ্রাণিত করলেও একসময় সে নিজে হয়ে পড়েছে হতাশাগ্রস্ত। বাবা তার বিয়ে ঠিক করলে সে অমত করেনি আর। কারণ তার মনে হয়েছে – 'অন্যকে গ্রহণ করলে একজনকে স্বীকার করে নিলেই হল, কারণ সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন অবান্তর।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১০৭)

সে নিমজ্জিত হয়েছে মনোবিকলনে আর জীবনের প্রতি উদাসীনতায়। হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তার মনে জেগেছে তারই ভূগোল শিক্ষকের অবসাদগ্রস্ততার কথা। ঔপন্যাসিক আমাদেরকে যেন লিনার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছেন তারই বর্ণনায় – 'শেষদিকে ছুরি দিয়ে হাত কেটে তাতে নুন মাখিয়ে রুমাল জড়িয়ে রাখতেন... বসন্তের এক গান ও হাওয়ার রাত্রে নিজেই নিজেকে মুক্তি দিলেন।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১০৬)

একান্ত ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সচ্ছলতা – কিছুই লিনাকে স্থিরতা বা শান্তি দিতে পারে নি, বন্ধুরাও নয়। সমকালীন বাস্তবতা ও সঙ্কটের প্রতি অবস্থাপন্ন মানুষের উদাসীনতাও তাকে ব্যথিত করেছে :

> একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ – দুইই ধ্বংসযজ্ঞ; তবু আশ্চর্য মানুষের আশার শেষ নেই। প্রত্যেকেই নিজের আদর্শ, নিজের বিশ্বাস নিয়ে সুখী। এই কি চেতনা? অথবা অন্ধতা? সারাদেশে কান্না, রাস্তাঘাটে শত শত লোক মরছে, কিন্তু তাই বলে কলেজে যারা আসবার তারা তো বাড়িতে বসে থাকেনি এবং কর্মক্ষেত্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েনি। তারা সেজে-গুজে, প্রজাপতি পাখনা উড়িয়ে কলেজেই আসে এবং সে কি কলকাকলি, উচ্ছলতা! এই যদি জীবনের ধর্ম হয়ে থাকে তা'হলে সে বড় নিষ্ঠুর। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৮৯)

এই সবকিছুই হয়তো তাকে বিমুখ করে তুলেছে জীবনের প্রতি, নিজেকে হয়তো অসহায়ই মনে হয়েছে তার। বাসর রাতে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। তার হৃদয়ের উন্মাতাল বিক্ষুব্ধতা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। তবু সে জোহার কাছে পূজনীয়ই থেকে গেছে তার সততা ও সহৃদয়তার জন্য।

অসহিষ্ণু আর উন্মত্ত রাজনীতি, দ্বান্দ্বিক-ব্যর্থ প্রেমের অসহায় শিকার মোহাম্মদ আলী। প্রেমের ক্ষেত্রে সে একদিকে সুজাতাকে প্রত্যাশা করে আবার লিনাকেও ফিরিয়ে দিতে পারে না। সুজাতার পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, আর তার অবহেলায় লিনা বেছে নেয় আত্মহননের পথ। ঔপন্যাসিক প্রগতিশীল রাজনীতির প্রকাশ দেখিয়েছেন মোহাম্মদ আলীর মধ্যে। মুসলিম লীগার রেজার সুবিধাবাদী রাজনীতির তীব্র বিরোধী সে, করতে চেয়েছে জনহিতের রাজনীতি। ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের দুঃখ তাকে আকুল করেছে। পরিণতিতে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল আয়োজনের কারণে সে প্রশাসনের তোপের মুখে পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সমকালের বাস্তবতা দেখে ভাবীকালের রাজনীতি নিয়েও তার ভয় ছিল–

> দেশের মুক্তি কোন্ পথে হবে, কি রূপ নিয়ে আসবে স্বাধীনতা? লাখে লাখে মরার পরেও যা থাকবে সেই ন্যুজপৃষ্ঠ কুজদেহ কংকালেরা সেই স্বাধীনতা নিয়ে করবেই বা কি। তারা কি নতুনভাবে শোষণের শিকার হবে না? বিদেশীর জায়গায় দেশীয় প্রভুর? আজকের কন্ট্রাক্টর চোরাকারবারী ও রক্তপিপাসু বণিকেরাই হয়তো হবে

> আগামীকালের রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক! এ এক রোমাঞ্চকর সত্য, অদ্ভুত পরিহাস। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিল কারা আর কারা করবে তার ফলভোগ। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৯১)

আমরা দেখব যে, আমাদের দেশভাগ ও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিতে তার আশঙ্কাই অনেকাংশে সত্যি হয়েছে।

রেজা সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রতিভূ। রাজনীতিবিদ বাবার নাম ভাঙিয়ে সে ভবিষ্যতে মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে যাওয়ার বদলে সে ঘরে বসে সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে, যাতে পরিবর্তিত রাজনীতির ফায়দা নিতে পারে। একই উদ্দেশ্যে সে বোন লিনাকে ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদের পুত্র কাশেমের সঙ্গে বিয়ে দিতে উৎসাহিত হয়েছে। তার পিতার মধ্যেও দেখি একই মনোবৃত্তি।

ফাতেমা প্রতিকূলতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত স্বামী-কন্যাকে হারিয়ে জোহা আর অনাগত সন্তানের ভরসায় আবার গ্রামে ফিরতে চেয়েছে। কিন্তু জোহার বোনের খোঁজে চট্টগ্রামযাত্রা পুনরায় তাকে নিমজ্জিত করেছে হতাশায়।

বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকালীন মানুষের অসহায়তার সুযোগে কিছু নরাধম লিপ্ত হয়েছিল নিজেদের স্বার্থ হাসিলে। শহর-গ্রাম সর্বত্র ছিল এদের বিচরণ। উপন্যাসটিতে গ্রামের দৃশ্যপটে আমরা দেখতে পাই সরকার আর ফেরু মুন্সিকে, যারা দরিদ্রদের উপকারের নামে কপট অভিনয় করে আখের গুছানোর ফন্দি করেছে :

> টাকা বানানোতে নেশা আছে এবং সে স্বাদ যে একবার পেয়েছে, তার কাছে একটি বাড়তি অঙ্কও লোমহর্ষক। এখন বর্ষণের কাল, জাল পাততে পারলেই হোল, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে পড়বে। লঙ্গরখানা তেমনি একটি জুতের জায়গা, তার তদারকের ভার পেলে নির্ঘাত লাল। লোককে ঠাণ্ডা রাখার জন্য অর্ধেক খরচাই যথেষ্ট। বাকি অর্ধেক ভাগাভাগি। চালের দর তো এখনই পঁচাত্তর-আশি, ডালও কম যায় না। সামনের দিকে চা, আর পিছনে, এখন, একটু-আধটু কায়কারবার আছে, কিন্তু আয়ের পথ যত খোলে, ততই ভালো। আশ্বাস পেয়ে মহাখুশি, এক প্যাকেট সিগারেট পকেটে গুঁজে দিলেন। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১১)

শহরে বাদশার মতো অনেকে টোপ দিয়ে বা অন্য নানা কুকৌশলে নারীদেরকে ভোগ করেছে, তারপর বিক্রি করে দিয়েছে পতিতালয়ে। অথবা ভোগের সামগ্রী বানিয়েছে মিলিটারির কাছে। এখানে আমরা দেখি বাদশা ক্রমাগত ভালো কথার টোপ দিয়েছে জহুকে :

> তোর লাইগ্যা মিষ্টি আনছি, খুব ভালো মিষ্টি! আয়–টেনে নিয়ে এল ঘরের ভিতরে, ঠোঙাটা খুলে সামনে ধরে বলতে থাকে, তোরে আমার খুব পছন্দ। রোজ আইবে

> কেমন? মিষ্টি খাওয়াইমু, কাপড় জামা, যা চাস তাই দিমু! আইবে? আইবে তো? (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৪৭)

শেষ পর্যন্ত জহু সেই ফাঁদে ধরা পড়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, হয়েছে কলঙ্কিত জগতের বাসিন্দা।

কিছু মানুষ এত সঙ্কটের মধ্যেও জীবনের অন্য মানে খুঁজতে চেয়েছে, নিজেদের সঁপে দিয়েছে ভাগ্যের হাতে। পুরান ঢাকার বাসিন্দা চান জীবনকে দেখতে চায় এভাবেই – 'জিন্দিগীটাই রেসখেলা'। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৮৩)

ক্ষুধা ও আশায় আমরা প্রেম দেখি কয়েকটি ক্ষেত্রে। কিন্তু কোনো প্রেমই শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। আলী, লিনা ও সুজাতার যে ত্রিভুজ প্রেম আর দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক তার সমাপ্তি খুবই হৃদয়বিদারক। লিনার প্রতি আলীর ক্রমিক উদাসীনতা লিনাকে ক্ষুব্ধ করেছে, একসময় সুজাতার প্রতি আলীর দুর্বলতার কথা জানতে পেরে লিনা পিতার পছন্দে বিয়ে করেছে, বিয়ের রাতেই করেছে আত্মহত্যা। এই দুর্ঘটনা আলীকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। সে ফিরিয়ে দিয়েছে সুজাতাকেও। নিমজ্জিত হয়েছে আত্মগ্লানিতে।

পাচারকারী দলের সদস্য হোসেন আকৃষ্ট হয়েছে জহুর প্রতি। এখানেও হয় নি মিলন। দলেরই অন্যদের হাতে খুন হয়েছে সে, জহু নিক্ষিপ্ত হয়েছে পতিতালয়ে।

লিনার বাবা-মায়ের মধ্যেও আমরা বিনষ্ট দাম্পত্য লক্ষ করি। তাদের মধ্যে নেই কোন হার্দিক টান, লিনার পিতা আরেকটি বিয়ে করে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই হয়েছেন কলকাতানিবাসী।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি, গায়েন দরবেশ চাচা আর জোতদার ফতেজান শিকদারের কন্যা রূপবানের প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শিকদার তার মেয়েকে গায়েনের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হয় নি। চিরকুমার দরবেশ চাচা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে গান গেয়ে আর পরের উপকার করে।

> ক্ষুধা ও আশার মধ্যবর্তী স্তরের নাম হচ্ছে সংগ্রাম। ক্ষুধা থেকে উত্তরণের পথটা সংগ্রামের, খোলাখুলিভাবে বললে শ্রেণী-সংগ্রামের। এমন কথা তাঁর মধ্যবিত্ত নায়ক মোহাম্মদ আলী ইঙ্গিতে বললেও অমন বিচ্ছিন্ন কথাতে উপন্যাসের মূল বক্তব্য অর্থাৎ 'আশা'র কথা ধ্বনিত হয় না। (নাজমা, ২০০৯ : ২৭৭)

তবু ছিন্নমূল জনতাকে সংগঠিত করার তার যে একক প্রচেষ্টা তা আমাদেরকে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশাহত করে না।

ক্ষুধা ও আশায় যতটুকু আশাবাদ আমরা পাই তার প্রায় সবই জোহা চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'জোহা-পরিবারের উন্মূলিত হওয়া এবং নিশেঃষিত হওয়া *ক্ষুধা ও আশার* চরম বাক্য নয়' (আকরম, ২০১০ : ১০৯)। গ্রামে থাকতেই সে গ্রামের স্কুলের

পণ্ডিতের স্নেহ, গ্রামের সবার শ্রদ্ধার পাত্র দরবেশ চাচার আশীর্বাদ লাভ করেছে। তাদের কাছে অনুপ্রেরণা পেয়েছে জীবনে বড় হওয়ার।

দরবেশ চাচা –

> অন্য সময় ছ'মাস ন'মাস বাইরে কাটায়, আকাল শুরু হলে যায়নি কোথাও। যতটা সম্ভব, প্রতিদিনের রোজগার দিয়ে ভুখাদের খাইয়েছে।
>
> জোহার জন্য কি যে টান। গেলেই গান শোনাত আর দেশ বিদেশের গল্প। ওকে বলত এই গেরামের বাতি। জ্বলবে, মানুষের ঘর করবে আলো। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ২৫)

'দুঃখকে ভয় করিসনে। দুঃখই আসল বন্ধু; সে তার দহনে পুড়িয়ে আমাদেরকে খাঁটি সোনা করে তোলে।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৪১) – এই কথা বলে লিনা তাকে দিয়েছে দুঃখকে জয় করার প্রেরণা। আলীর কাছে সে পেয়েছে পরোপকারের মন্ত্র, দশের উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করার শক্তি। বোন জহুকে উদ্ধারের চেষ্টায় সে যাত্রা করেছে সামান্য আলো অনুসরণ করে। পথে এক আসন্নপ্রসবাকে সাহায্য করেছে প্রসবে! মা ও সন্তানকে রক্ষা করেছে প্রচণ্ড শীত আর হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে। তার এই সৎ সাহসগুলোর পেছনে হয়তো গোপনে কাজ করেছে বাবা হানিফের সততা, যে প্রচণ্ড অভাবে পড়েও চুরি করতে যেতে রাজি হয়নি।

৫

মোট সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসটি। কাহিনি-নির্মাণে আলাউদ্দিন আল আজাদ এখানে নিরীক্ষাপ্রবণ। প্লট-গঠনে তিনি বাঁধা-ধরা কোনো নিয়ম অনুসরণ করেন নি। চরিত্রের সঙ্গে যেন ঘটনা এগিয়ে গেছে। চরিত্রের চিন্তার সূত্র ধরেই কখনো ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়েছেন লেখক, আবার কখনো বর্তমানের বর্ণনা দিয়েছেন। চরিত্রের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে স্থানও। নরসিংদীতে উয়ারী বটেশ্বরের কাছাকাছি একটি গ্রাম থেকে শুরু হয়েছে উপন্যাস। গ্রামত্যাগী উদ্বাস্তু মানুষের সঙ্গে কাহিনি প্রবাহিত হয়েছে ঢাকায়। তারপর আবার অপহৃত জহুর সঙ্গে চট্টগ্রামে বিস্তৃত হয়েছে ঘটনাস্থল। জোহার সঙ্গে উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে চট্টগ্রামে এবং সেখানেই বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি কোনো এক স্থানে সমাপ্ত হয়েছে।

'*ক্ষুধা ও আশা*ও ব্যক্তির গভীরতর অন্তর্জীবনের এপিক।' (আকরম, ২০১০ : ১১৪) বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চেয়ে উপন্যাসটিতে অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়েছে চরিত্রসমূহের অন্তর্জগৎ। সমালোচকের মতে –

> এ-উপন্যাসে প্রধান চরিত্র জোহা এবং অন্যান্য চরিত্রের আন্তরজাগতিক প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ ঘটেছে। ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রচিত্তের অস্থিরতা, উদ্বেগ,

> যন্ত্রণা ও রক্তপাত প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে, উপন্যাস হয়ে উঠেছে চরিত্রচেতনানির্ভর। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ২০১)

মনোজগতে ঘটনাসমূহের প্রতিক্রিয়া চরিত্রগুলোকে আলোড়িত করেছে অনেক বেশি। সেই আলোড়নই চরিত্রগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রেখেছে।

উপন্যাসটি বিবৃত হয়েছে মূলত ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হানিফ, জোহা ও জহুর দৃষ্টিকোণও ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসে ফ্ল্যাশব্যাক এসেছে জোহার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। চেতনাপ্রবাহরীতি এসেছে জোহা, জহু ও হানিফের চিন্তায়।

নাটকীয়তা দেখি আমরা কিছু চরিত্রের আচরণে। সুজাতার ভাই অরুণের আকস্মিক আচরণ তেমনই মনে হয় : 'খ্যাপা ছেলেটা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে তা নিজের কপালে ছোঁয়াবার পর বলল, না মা! তুমি হচ্ছ দেশমাতৃকার প্রতিরূপ। তোমাকে আমি প্রণাম করি!' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৩৪)

ঔপন্যাসিক চরিত্রানুগ ভাষা প্রয়োগে অত্যন্ত সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষিত, সুবিধাবাদী, গ্রামীণ মানুষ, বস্তিবাসী, পতিতালয়ের মানুষ, ইংরেজ প্রভৃতি নানা শ্রেণির মুখে বসেছে তাদের নিজ নিজ বুলি। ফলে কোনো চরিত্রকেই আরোপিত বলে মনে হয় না। ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যিক গদ্যও। উপন্যাসটির গদ্যশৈলীর কুশলতা অনন্য। গ্রামের শব্দ 'তরজার ঘর, আরঙ, কিসমৎ, কনুইজাল, ভরজাল, ধর্মজাল, কইজাল, কোচ, পল, ট্যাটা' প্রভৃতির পাশাপাশি শহরের শব্দ 'ব্ল্যাকআউট, ন্যাষ্টি, অর্নামেন্ট, ক্লাসফ্রেন্ড' – এসবের ব্যবহার উপন্যাসটিকে অনেক বাস্তবসম্মত করেছে। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগও লক্ষণীয় :

> 'যা বুরাইগ্ গা!' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ২৪)
>
> 'গোলমাল করলে আমারে ডাক দিও দেহি কোন্ গুলামের পুৎ ব্যাডাগিরি দেহায়!' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ২৮)

শিশুমনের ফ্যান্টাসির জগৎ উন্মোচনে ঔপন্যাসিক সফল :

> জহু বলেছিল, সে পরীর দেশে চলে গেছে, সেখানে সোনার গাছে সোনার ফুল রুপার পাতা। ঢোল-ডগর বাজছে অষ্টপহর, কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা হৈ হুল্লোড়। সাদা এক ফালি কাপড় জড়িয়ে সন্ধ্যার সময় ওকে বাঁশঝাড়ের নীচে পুঁতে রাখল। নাকি, রাত যখন নিঝুম হয়ে আসবে, দেখা দেবে একফালি চাঁদ, তখন সে জাগবে, ছোট্ট তুলতুলে হাতগুলো দিয়ে বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকবে ওপরে। চাঁদের নৌকায় পরীর মেয়েরা; তারা কাছে আসবে নেমে, ওকে ধরে তুলে নিয়ে যাবে চমৎকার! (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৪)

গ্রামোপযোগী প্রবাদ ব্যবহারও বাস্তবতাকে রূপায়িত করেছে – 'বৌয়ের মধ্যে কালাবৌ, গাইয়ের মধ্যে কালাগাই আর মাটির মধ্যে কালামাটি। এরাই সেরা এরাই খাঁটি।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৫৩)

ইঙ্গিতময় ভাষা-ব্যবহারে ঔপন্যাসিক নিরীক্ষাসফল। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১১৪) – এই গানটি গেয়ে যেন লিনা তার আশু আত্মহত্যার ইঙ্গিতই দিয়েছে। স্বগত সংলাপে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন লিনা চরিত্রের বিক্ষুব্ধ মানসকে –

> কেন মরতে চাও, কেন মরবে তুমি? – আমার ইচ্ছে আর সব ইচ্ছের তো অর্থ থাকে না? – সব ইচ্ছেরই অর্থ থাকতে হয় নইলে পৃথিবীতে বাস করা চলে না, বুঝলে বোকা? – বুঝেছি এবং আমি তো আর থাকতে চাই না এই পৃথিবীতে এমন জঘন্য জায়গায়। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৩২)

আবার শিক্ষিতজনদের মুখে বসেছে ইংরেজি সংলাপ।

অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানাবিধ নিরীক্ষা চালিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। উপমার ব্যবহারে তিনি অনবদ্য –

> কালো পিঁপড়ের ঝাঁকের মতো পোলাপানেরা কিলবিল কিচিরমিচির করছে। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৪১)
>
> কান্নাভরা চোখে সামনের জগৎটা কাঁপছে টলটলে অশ্রুবিন্দুর মতো। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৪৯)

ব্যবহৃত হয়েছে 'চাঁদের নৌকায় পরীর মেয়েরা; তারা কাছে আসবে নেমে' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৪)-এর মতো রূপক। আছে উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার – 'বটগাছটা যেন এক বিশাল ছাতা।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭)

সমাসোক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উপন্যাসে নিরীক্ষা লক্ষণীয় :

> ডাক শেষ হলে ঝাঁকে ঝাঁকে নীরবতা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৩৮)
>
> – একবার হালকা হলুদ রং পর্দাটা সরিয়ে দেখা যাক, দেখা যাবে, সময়ের হৃদপিণ্ডটা হাড়ের শীতল গহ্বরে মাকড়শার মতো নির্ভীক ঝুলছে। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১১৪)

Intertexuality বা আন্তর্পাঠ পদ্ধতির ব্যবহার উপন্যাসটিকে দিয়েছে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। উপন্যাসে জহু চরিত্রকে একটি ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস *পথের পাঁচালী*র কিশোরী দুর্গার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে সন্দেহ হয়। দরিদ্র

কিশোরী সামান্য বিলাসের ইচ্ছায় চুরিতে প্রবৃত্ত হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। উভয়েই ধনী বাড়ি থেকে চুরি করেছে সোনার কৌটা। কিশোরী মনের খেয়াল অথবা অভাব হয়তো তাদেরকে বাধ্য করেছে এই কাজে।

পিতার মৃত্যুর পর শোকাকুল অস্বাভাবিক জোহার স্বগত সংলাপের সঙ্গেও *পথের পাঁচালী*র সাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'দুত্তর বোকা, ভুল করছিস, তোকে মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে থাকলে চলবে না। অনেকদূর যেতে হবে, বহুদূর!' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৯৯)। পক্ষান্তরে সমধর্মী ইঙ্গিতময় উদ্ধৃতি –

> পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন – মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...
>
> দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনো ফুরোয় না... চলে... চলে... চলে... এগিয়েই চলে... (বিভূতিভূষণ, ১৯৯৬ : ১৭০)

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে প্রতীকের শিল্পসফল সংযোজনে। 'সমুদ্র হয়তো বেশি দূরে নয়। শুনেছে সকালে দুপুরে সারাদিন সেখানে ওড়ে অনেক গাঙচিল।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৪৪) – সমুদ্রের ওপর উড়ন্ত গাঙচিলের প্রতীকে ঔপন্যাসিক যেন জোহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দের সন্ধানকেই মূর্ত করেছেন।

৬

ক্ষুধা ও আশায় আলাউদ্দিন আল আজাদ বলতে চেয়েছেন জীবনের কথা, যে জীবন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সততা-অসততা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, নৈতিকতা-নীতিহীনতায় পূর্ণ আমাদের বাস্তব জীবন। সে জীবনই সঙ্কটে পড়ে কীভাবে আরও জটিল ও ক্লেদময় হয়ে ওঠে তার সাক্ষ্য এই উপন্যাস। ক্ষুধা কীভাবে ব্যাপক মানুষকে মৃত্যু আর বিনষ্টের মুখে ঠেলে দেয়, তাদের সুন্দর জীবন আর পরিবার-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, তারই উপস্থাপন ঘটেছে এখানে। তবু ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত আশাহত হন নি। সমাপ্তিতে তিনি আশার কথাই বলেছেন। ইতিবাচকতা

নিঃশেষ হয়ে যায় না। মানুষ ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায়, যা আছে তাই নিয়ে আবার বাঁচার চেষ্টা করে। জীবনের জয়গানই শেষ পর্যন্ত গাইতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক, অনন্য শিল্পসৌন্দর্যে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরম হোসেন, সৈয়দ (২০১০)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*। দ্বিতীয় প্রকাশ, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, বাতায়ন

তবিবুর রহমান (২০১৫)। *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয় ও প্রকরণ*। গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*। প্রথম প্রকাশ, অবসর, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*। প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শাহীদা আখতার (১৯৯২)। *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)*। প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.) (২০০৩)। *আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন সাহিত্য*। প্রথম প্রকাশ, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা

হাফিজুর রহমান (২০১২)। *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। প্রথম প্রকাশ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা